



Vol. 55 | No. 2 | 2018



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কবিতা : অঙ্ককারের রূপকল্প

Volume	55
Issue	2
Year	2018
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জয়নাব বিনতে হোসেন
Published online	February 1, 2018
DOI	10.62328/sp.v55i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v55i2.9
Pages	১৬৯-১৮৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কবিতা : অন্ধকারের রূপকল্প

জয়নাব বিনতে হোসেন*

সারসংক্ষেপ : কবিতা হচ্ছে সেই শিল্প যার রয়েছে একটি নিজস্ব বাহ্যিক আবরণ। কবিতা তাই বাস্তবের ভেতরেও অতিবাস্তব, শিল্পের উচ্চতর সত্তা। কবিতা তাই আচ্ছন্ন করে, অতঃপর একটি অখণ্ড পূর্ণায়ন বৃত্তের সম্পূর্ণতায় স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয়ীদের ভাসিত করে নিয়ে যায় ভিড় থেকে দূরে, একান্ত অন্ধকারে, নিজেরই কেন্দ্রে, নিজেরই মুখোমুখি। ফলে, কবিতায় আপাত অন্ধকার হয়ে ওঠে চেতনার সবচেয়ে আলোকিত দিক, উন্মোচন করে নিজ্ঞান, জন্ম থেকে মৃত্যুর রহস্যময় দিক, সত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতায় ‘অন্ধকার’ মূলত প্রকাশ করেছে মানুষের অন্তর্নিহিত কেন্দ্রের অস্তিত্ব; নেতির পরিবর্তে ইতি – যা ব্যক্তি ও চেতনামণ্ডলকে অবিরাম প্রসারিত ও পরিণত করে তোলে, রচনা করে বাস্তবতা ও শিল্পের অধ্যাত্মের অন্তর্বিয়িত শিল্প।

কবিতার ইতিহাস ও দর্শনের ইতিহাস অভিন্ন না-হলেও আমাদের জ্ঞাত ইতিহাসে কবিতা এবং দর্শনের যাত্রা প্রায় সমসাময়িক। মানুষের আদি অর্থবহ ধ্বনি যদি কবিতা হয়, তবে দর্শনের শব্দরূপায়ণের আগেই কবিতার উদ্ভব। কবি যেমন প্রভাবিত হতে পারেন দর্শনচিন্তা দ্বারা, ঠিক তেমন দার্শনিকও কবি বা তাঁর কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। মানুষের প্রথম উচ্চারণটি মন্ত্র ছিল, না কবিতা – তার আবিষ্কার সহজ নয়; কিন্তু কোনো দর্শন যে তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কবিতার ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের বহুমুখী আত্মপ্রকাশের যুগান্তকারী প্রয়াস সম্পর্কযুক্ত। প্রাচ্য দর্শনের ধ্যানমন্ত্রগুলো কবিতার আদিধ্বনির মতো হলেও কবিতাচর্চায় তার স্বীকৃতি এসেছে অনেক পরে। আবার পরাগের রেণুর মতো উড়ে আসা বীজে কোনো কবির কবিতার একটি চরণ বা ভাব অন্য একজন কবির মনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। অনেক সময় সেই অবচেতন অনুকম্পন থেকে অন্য একটি কবিতার বীজসৃষ্টি ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আর তাই যুগের পরম্পরায় এক কবির সঙ্গে অন্য কবির চেতনাগত মিলের সাযুজ্য দুর্লভ নয়।

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ইন্দ্রিয়লোক থেকে ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিকতায় উপনীত হতে দর্শনের মতো কবিতাকেও অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেক কাল। যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছিল, প্রাচ্য দর্শন তার মতো বস্তুবাদী ছিল না। ইলিয়াড-ওডিসির সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করলেই তার প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাচীন সাহিত্য-শিল্পে দেখা যায়, ধর্মকে আশ্রয় করে যখনই শিল্প রচিত হয়েছে, তখনই তা পৌরাণিক উপকরণে আচ্ছন্ন হয়েছে। অথচ রোমান্টিক চেতনায় তা অধিবিদ্যক বাচনে একটি দার্শনিক তাৎপর্য পরিগ্রহণ করেছে। আর এখানে ভালো-মন্দের মতো আলো-অন্ধকার নিয়ে এসেছে দার্শনিক পরিক্রমা ও শিল্পের ব্যঞ্জনাময় প্রত্যয়।

প্রাচ্য জীবনাদর্শ, সাহিত্য ও দর্শনের দুই মহান প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জীবনানন্দ দাশ। তাঁদের কবিতা, সাহিত্যসৃষ্টি, দর্শন দুই আদর্শ ও ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের রোমান্টিক জীবনাদর্শের প্রতিনিধি আর জীবনানন্দ দাশ বিশ শতকীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এক ক্ষয়িষ্ণু, বিষণ্ণ, অবসাদগ্রস্ত সময়ের প্রতিনিধি। একজন ইতিবাচক জীবনাদর্শকে প্রকাশ করেছেন, অপরজন নেতিচিন্তার সর্বোত্তম প্রকাশের এবং তার অভিব্যক্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু এই দুজন কবির জীবনবিন্যাস ও জীবনদর্শনের দিকে তাকালে দেখা যায় এক গভীরতর ঐক্য এই দুজনের জীবনায়ন, জীবনভাবনা, সাধনা এবং আরাধনার মধ্যে রয়ে গিয়েছে। এই দুজনই যে দর্শন ও ধর্মভাবনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তাঁরা আত্মমুক্তির সন্ধান করেছেন এবং তাঁদের ধ্যান ও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে যাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন তা হল উনিশ শতকীয় নব-উদ্ভাসিত ধর্মভাবনা, যার নাম ব্রহ্মধর্ম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্রহ্মমন্ত্র' প্রবন্ধে বলেছেন :

সংসারী জীবের পক্ষে একটিমাত্র প্রার্থনা আছে যে প্রার্থনা – অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত্তে লইয়া যাও। সত্যকে মিথ্যা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোর প্রার্থনা বিড়ম্বনামাত্র। (রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৫, ১৪০২ : ১৪৬)

জীবনানন্দ দাশের মাতৃ-পিতৃ স্মৃতিতর্পণেও পাওয়া যায় উপনিষদের গভীরবোধ ও উপলব্ধি। পিতা সত্যানন্দ দাশ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন –

ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, পরিবারে সব বিষয়েই তিনি মোহজড়তা মুক্ত হয়ে প্রজ্ঞাকামী দার্শনিক মানুষ ছিলেন। একমাত্র উপনিষদের আঙ্গিক ও আন্তরিক সত্যের সৌন্দর্যের শান্তির সম্বন্ধে তিনি কোনোদিন কোনো দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন নি। প্রায় রোজ শেষরাতে বিশেষত হেমন্ত ও শীতকালে উপনিষদের শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে তিনি আমাদের অপরূপ সূর্য-চেতনার প্রভাবে নিয়ে আসতেন। তারপর সকালবেলায় রৌদ্রের সাগরের ভিতর যখন একাকী বসে থাকতেন তখন মনে হত মহাকবির মতন

তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন ‘তুমি কী করতে এসেছ অসীমদেশ ও অসীমকালের একপ্রান্তে’? এর উত্তরে মন বলে : আর কিছু নয়, জীবনে এই কথাটি প্রকাশ করতে এসেছি যে ‘দেখা হয়েছে’; এই উত্তরটি সমস্ত কর্মের মধ্যে নিহিত, সমস্ত বাধার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। (জীবনানন্দ-রচনাবলী-৪, ২০০৬ : ৬০০)

মা কুসুমকুমারী দাশ সম্পর্কে তাঁর রচনায় অধিকতর মগ্নতার পরিচয় মেলে—

চারিদিকে শীতের রাত যখন নিথর, নিস্তব্ধ; আমাদের বাড়ির থেকে খানিকটা দূরে নারিকেলবীথির ভিতর থেকে বাতাকুড়ুল পাখি ডাকত, প্রহরে প্রহরে সেই পাখিদুটো বরিশালের শীতের শিয়রে অনন্ত অন্ধকারে দেবযানী আল্লাদের মতো। মা ঘরে এসে ঘুরতেন ফিরতেন এবং সেবা করতেন দূরে পাখি ডাকে আমি এখনো জেগে আছি কেন কত দূর কী পড়াশোনা করেছি জিজ্ঞেস করতেন। ঘুমিয়ে পড়তে বলতেন। বাইরে পৃথিবীর অন্ধকার অঘ্রাণ পৌষের শীত। (জীবনানন্দ-রচনাবলী-৪, ২০০৬ : ৫৯৪))

ব্রহ্ম নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন বিশ্বজগৎ। তাই ব্রহ্মের নিজেকে প্রকাশ সৃষ্টির বিচিত্র বহুত্বের মধ্যে। সংসদ অভিধান মতে শব্দটির মূল হচ্ছে বৃহ+মন। “আবর্তনশীল অতিবাহীর না করণ, অনকরণের (বা রহস্যরূপের) হওয়ন বিষয়ক মনন যাহাতে”। (খান ও চক্রবর্তী, ১৪১৭ : ১৯৭) রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের ব্রহ্মচিন্তা মননেরই অংশ এবং আরো বিশদভাবে বস্তুজীবনের বিকাশ, বৃদ্ধি ও উত্তরণের সঙ্গে যুক্ত। “এ অর্থে বিশ্বের সকল জ্ঞানের সর্বোচ্চ অবস্থানরূপে ‘ব্রহ্মজ্ঞান’ বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ও অধ্যাত্মজ্ঞানের মনন যেভাবে বিকশিত ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে সেই জ্ঞানটিকেই ‘ব্রহ্ম’ বলা যেতে পারে। তাঁর প্রেম ও প্রকৃতিচেতনা, সমাজ-দেশ-সংসারভাবনা, সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞা ও প্রতিভা ইত্যাদির মুহূর্মুহ পরিবৃদ্ধি, আবর্তন ও বিকাশনেই আমরা তাঁর ব্রহ্মচেতনাকে অন্তঃশীলরূপে পাই। কারণ তাঁর ব্রহ্মচিন্তা দার্শনিকদের কাছেও একটি প্রহেলিকা, এবং প্রফেশনাল জ্ঞানতত্ত্বের মানদণ্ডে তাঁর ‘ব্রহ্ম’কে ঠিক ব্যাখ্যাও করা যায় না”। (আকতার কামাল, ২০১৭ : ১৯)

একই কথা জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনার বিবর্তন সন্ধান করতে গিয়ে একজন আলোচক যে মন্তব্য করেন, সেখানেই দুই কবির জীবনোপলব্ধির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে :

He is impersonally personal, finitely necessary and contingently infinite. He, the formless, continually yearns for forms while the counterpoint, in the other direction, is fiddled in and through the perennial human quest for Him, the Formless. And it is in the felt union of these two mutually complementary perspectives that Tagore’s Man-in-God-or-God-in-Man emerges as the Universal Creative Soul that is Man in essence. (Chunkapura, 2008 : Foreword)

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মাঝে ব্রহ্মকে দেখেছেন, ব্রহ্মের মূলে গিয়ে মনন বা চিন্তার উচ্চতাকে বুঝেছেন। বস্তুর গুণবাচক পরিবর্তন ধাপে ধাপে চূড়ান্ত জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছায় আর জ্ঞানের সর্বোচ্চ অবস্থান ব্রহ্মকেই প্রাচীন ঋষিরা বলতেন ‘ব্রহ্ম’ জ্ঞান; যে ব্রহ্ম অর্থান্তরিত হয়ে সমাজে হয়তো ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এর আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছোনো যায় না। সেই মুহূর্তিক জ্ঞান বা সজ্ঞার (intuition) স্তরে যেতে প্রয়োজন আত্মনিমগ্ন ধ্যান, অন্ধকারের মাঝে এক আলোকবিশ্ব। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও এই কথা অনেক বেশি সত্য মনে হয়, যখন তিনি বলেন –

সে কি প্রেম? অন্ধকার? ঘাস ঘুম মৃত্যু প্রকৃতির
অন্ধ চলাচলের ভিতরে।
স্থির হ’য়ে আছে মন; মনে হয় তবু
সে ধ্রুব গতির বেগে চলে,
মহা-মহা রজনীর ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে;
সৃষ্টির গভীর-গভীর হংসী প্রেম
নেমেছে – এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।
(অনেক নদীর জল : বেলা অবেলা কালবেলা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কৈশোরে হিমালয়ে যেতেন এবং প্রথম দিকে স্বাভাবিক বালক-মন পিতার ধ্যান, হিমালয় পর্বতের বিশালতা, গান্ধীর্ষ উপভোগে নিবিষ্ট থাকতো। আর জীবনানন্দ দাশ সেই সুদূর বরিশালে বসে যে ধর্ম এবং দর্শন দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন, সেটাও গভীর আরাধনানির্ভর জীবনচিন্তার উৎস। খুব গভীরভাবে এই দুই কবির সৃষ্টিকর্মে অনুপ্রবেশ করলে দেখা যায় ধ্যান মানুষকে প্রথমত এক অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, যেখানে সমস্তই এক শূন্য অস্তিত্বে নিমজ্জিত। রবীন্দ্রনাথ তাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করতে ‘যে’ রূপী জীবনদেবতা, চিরসখা, নাথের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর অন্ধকার-উপলব্ধির পরিপূর্ণ চিত্র ধরা পড়েছে নিম্নোক্ত অবলোকনে :

রবীন্দ্রনাথের দর্শন, অভিজ্ঞান ও বোধে ‘অন্ধকার’ কখনো হিরণ্যগর্ভ, কখনো নিদ্রিত নারায়ণের নাভিগহ্বর অথবা অনন্ত নাগের গাত্রচর্ম কিংবা মাতৃগর্ভের অন্ধকারের মতো সৃষ্টিসম্ভবা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অন্ধকার, কখনো বা গুহায়িত মহা-একা এবং তাঁর উপনিষদ-পরিপ্লুত বিশ্বাসে স্রষ্টার আদি কারণ – আলোকময় বিচ্ছুরিত রূপ যার আদি শিল্প : আদিম অন্ধকার থেকে আলোকে প্রকাশ অর্থাৎ সৃষ্টি। (আকরম হোসেন, ১৯৯৭ : ২৮)

পূর্ণতার দিকে ধাবমান অন্ধকারের বহুস্তর ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল চেতনাকে ভিন্ন মাত্রায় জাগ্রত করেছে। তাঁর কবিতা ও গানে অসীম, শূন্যতা ও অন্ধকারের পৌনঃপুনিক ব্যবহার আলো ও অস্তিত্বের পথেই ধাবিত হয়েছে। অন্যদিকে জীবনানন্দ

দাশও এই অসীম শূন্যতায় নিমজ্জিত হয়েই সত্তাকে লীন করেছেন এবং সেখান থেকেই নিজের অস্তিত্বকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। মানুষ যখন চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন হয় এবং গভীর অন্ধকারের চৈতন্যকে উন্মোচন করে, তখন সেই অন্ধকাররূপী সত্তার মাধ্যমেই জাতিত বোধকে মহাবিশ্বের বিশাল পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পর্যায়ের কবিতা থেকেই অন্ধকারের ক্রমায়ত ব্যবহার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ক্রমায়ত অন্ধকারের মধ্য দিয়েই যে মহাকালের মানবযাত্রা, তাকেই তিনি কবিতায় অনুসন্ধান করেন। আবার জীবনানন্দ দাশের সব উল্লেখযোগ্য এবং পাঠকের মধ্যে ক্রিয়াশীল ও সংবেদনশীল কবিতার মধ্যেও অন্ধকারের সেই ক্রমায়ত ব্যবহার লক্ষণীয়, যার মধ্যে নিমজ্জিত থেকে তিনি আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মসত্তাকে অনুসন্ধান করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলো’ এবং জীবনানন্দের ‘অন্ধকার’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ দুইয়ের মধ্যে এক গভীর গভীরতর ঐক্য রয়েছে; আর তা হলো গভীর জীবনার্থের ঐক্য, জীবনদর্শনের ঐক্য এবং আরাধনার ঐক্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের একটি কবিতার নাম হল ‘তারকার আত্মহত্যা’। সেই তারকাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখিয়েছেন, তাতে তার মধ্যে দেবত্বের অনুসন্ধান করা দুর্লভ নয়। আবার জীবনানন্দের মৃত নক্ষত্রের জগতে অনুপ্রবিষ্ট হলে পাঠকের চেতনালোকে রবীন্দ্রনাথের নক্ষত্রের ব্যবহারটি ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন পথ উন্মোচন করে দেয়, যেখানে দুজন কবিই এক অন্ধকার জগতের সংকল্পনায় বাজায় হয়ে উঠেছেন।

‘তারকার আত্মহত্যা’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, এক আলোকময় জগৎ থেকে অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে এক তারকার পতন, যে তারকা আঁধার ঢাকতে এতদিন নিজে অঙ্গারের মতন জ্বলেছিল। মানবজীবনের সূত্রপাত যে অন্ধকার গহ্বর থেকে, আবার মধ্যবর্তী একটি ছায়া-বাস্তবময় জীবন অতিক্রান্ত হলে সেই আদিম অন্ধকারেই বিলীন হয়। আর তাই অন্ধকারে রহস্য আর আলোতে প্রকাশ বিরাজমান। সেই রহস্যের অতলগহ্বরে ডুব দিয়ে মানবসত্তাও আলোকিত জ্ঞানের সন্ধান করে চলতে চায়;

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,

আঁধারসাগরে –

গভীর নিশীথে

অতল আকাশে।

হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কি রে যায় তোর

ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে

ওই আঁধারসাগরে

এই গভীর নিশীথে

ওই অতল আকাশে।

(তারকার আত্মহত্যা, সন্ধ্যাসংগীত)

রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনানন্দের প্রথমদিকের কবিতায় ‘অন্ধকার’ রোমান্টিক কবিমানসের চিরায়ত বৈশিষ্ট্যরূপে বিধৃত হয়েছে। আবার কখনো কখনো অন্ধকারের রূপের মাঝে জীবসত্তা আরোপ করা হয়েছে –

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো
মিশে থাকতে চেয়েছি।

(অন্ধকার, বনলতা সেন)

এ যেন বাস্তবকে অতিক্রম করে এক অধিবাস্তব জগতে কবির অন্তর্সত্তার গভীর শিল্পবিলীন হয়ে ওঠার অনুভূতি। কবি যেখানে মানুষ ছিলেন না বলে মনে করেন, চিরপরিচিত পৃথিবী হয়ে ওঠে অপরিচিত, অচেনা। পৃথিবীর কদর্যতা, ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে চান গভীর অন্ধকারের ঘুমের কাছে, যেখানে বস্তু-অবস্তু, প্রাণী-অবপ্রাণী, মূর্ত-বিমূর্ত, স্মৃতি-অভিজ্ঞতা-কল্পনা সবকিছুই ইন্দ্রিয়বেদ্য শারীরিকতায় আলাদা আলাদা স্বর-শ্রুতি-গন্ধ-অস্তিত্ব নিয়ে তার কবিতায় হাজির হয়। বস্তুত ‘বনলতা সেন’ কাব্যের এই ‘অন্ধকার’ কবিতাটি কবির রোমান্টিক কাব্যমানসকেই নতুন কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করে। সমগ্র কবিতাটিতেই আছে মানবসত্তার বিবর্তনের ইতিহাস – যেখানে জীবন অন্ধকার থেকে জাগরিত হয়ে আবার অন্ধকারেই লীন হয়ে যাচ্ছে। আর মধ্যবর্তী চৈতন্যের কালেও সর্বনাস্তির হতাশার অন্ধকার আচ্ছন্ন। “গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছলছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার;” – যেন এই জগতের পূর্বেও ছিল ভিন্ন জগত, কবি বারবার এক জগত থেকে আরেক জগতে সঞ্চারিত হচ্ছেন, চেতনাপ্রাপ্ত হচ্ছেন, মানবজন্মের ভ্রণাবস্থা অর্থাৎ অব্যক্ত জীবনের স্তর থেকে আবার সমগ্র প্রান্তিক সংকটের বিপন্ন অস্তিত্বের মাঝে কবি-হৃদয় ক্লান্ত, অথচ শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে লীন হতে চেয়ে প্রকাশ করলেন। এখানেই আছে নবতর জীবনের বীজ। অন্ধকার জীবনানন্দের কাছে মায়ের মতো, মানুষের দেহের সব দোষ প্রক্ষালন করে দিয়ে বিহ্বল আত্মার অপরাধ, ক্লান্তি, ভ্রান্তি, ভয়, পাপ মুছে দিয়ে তাঁকে করে তোলে বীতকাম। এই নির্মলতা লাভ করার জন্যই অন্ধকারে মিশে যেতে চাওয়া।” (শ্যামল, ১৩৯৪ : ৪৪)

‘অন্ধকার’ কবির দ্বন্দ্বমুখর সত্তাকে প্রকাশ করলেও এর মর্মস্থলে রয়েছে অনন্ত অতৃপ্তি (eternal insatiety) যা তাঁকে আরো গভীর অন্ধকারে লীন করে দেয় :

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদম্য নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে,
রয়েছে যে অগাধ ঘুম,

সে-আশ্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,
 তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও –
 জানো না কি চাঁদ,
 নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
 জানো না কি নিশীথ,
 আমি অনেক দিন – অনেক-অনেক দিন
 অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
 হঠাৎ ভোরের আলোর মুখ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে
 বুঝতে পেরেছি আবার।
 (অন্ধকার, বনলতা সেন)

জন মিডলটন মারি 'প্রিসিসন' বা 'সুমিতি' বোধ দিয়ে কাব্যের ইমোশন বা আবেগের সংহতি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। আসলে সাধারণের সঙ্গে কবিদৃষ্টির পার্থক্য হলো সাধারণ মানুষ বস্তু বা বিষয় প্রত্যক্ষণকালে পূর্ব থেকেই প্রয়োজনের দ্বারা আক্রান্ত থাকে বলেই বস্তু বা বিষয়ের সত্যস্বরূপ দেখতে পান না। কিন্তু কবি তাঁর তৃতীয় দৃষ্টির সাহায্যে বস্তু বা বিষয়ের সত্যস্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। হিউম বস্তুর সত্যস্বরূপ দেখাকেই কবির অন্যতম আদর্শকর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, he must train himself for the concentrated state of mind, expression of what one sees. (Hulme: 1993 : 76) কবিকে অবশ্যই সত্যস্বরূপে বস্তুকে দেখতে হবে। কবিতায় তার যথার্থ প্রকাশের জন্য কবির মানসসংহতি এবং ব্যক্তিসত্তার উপর কর্তৃত্ব আবশ্যিক। তবে প্রতীয়মান কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন, একক, নৈর্ব্যক্তিক, শুদ্ধ, স্বয়ংসম্পন্ন নয়; সুতরাং কবির পক্ষে কোনো বস্তু বা বিষয়কে শুদ্ধ নিরঞ্জন সত্তায় দেখা আবশ্যিক নয়। সৃষ্টির পথে কবির চেতনায়, দর্শনে বৈচিত্র্য যেমন দেখা যায়, রূপান্তরও দুর্লভ্য নয়। এই পোয়েটিক থট বা কাব্যচিন্তা কবির অনুভূতিকে একটি শিল্পপ্রকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। ভাব (আইডিয়া) বা বিষয় (থিম) চিত্রকল্পের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় রূপান্তর-সাধনের প্রচেষ্টার সঙ্গে কবির ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কবিতায় 'অন্ধকার চেতনা' জারমিনাল ইমেজ হিসেবে প্রাসঙ্গিকভাবেই আলোচনার পথ নির্মাণ করে। প্রথমদিকের কাব্যে 'অন্ধকার' একটি রোমান্টিক কবিমানসের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করলেও পরে তা বিবর্তিত হয়, যেখানে অন্ধকারের ওপর একটি জীবসত্তা আরোপিত হয়েছে।

জীবনের আবির্ভাব যেমন 'অন্ধকারের উৎস হতে' আবার সেই অন্ধকারেই জীবনের প্রত্যাবর্তন। রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় অন্ধকারের এই বিন্যাস লক্ষ করা যায়। ভারতীয় ধ্যানসাধনা ও তন্ত্রে এই অন্ধকার চেতনার মূল নিহিত রয়েছে 'শ্রীশ্রী চণ্ডীতে'। মহামায়ার বন্দনায় বলা হয়েছে, "আধারভূতা জগতন্তুমেকা মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি।" (জগদীশ্বরানন্দ : একাদশ অধ্যায় : ৩০) একের মধ্যে বহুর প্রকাশ

এভাবেই ঘটেছে। ইনি মহামায়া, মহাযাত্রা, কালরাত্রি স্বরূপ, ব্যক্ত আবার অব্যক্ত, আধার শক্তিস্বরূপ। রূপান্তরধর্মী রবীন্দ্র-চৈতন্য ও কবিতায় অন্ধকারের প্রকাশ বিচিত্ররূপী, অনেকটা তাঁর জীবনদেবতার মতো। ‘ছবি ও গান’ কাব্যের ‘রাহুর প্রেম’ কবিতায় অন্ধকারের রূপ তাই সর্বগ্রাসী :

হেরো তমোঘন মরুময়ী নিশা -
আমার পরান হারায়েছে দিশা,
অনন্ত ক্ষুধা অনন্ত তৃষা
করিতেছে হাহাকার।
আজিকে যখন পেয়েছি রে তোরে
এ চিরযামিনী ছাড়িব কী করে,
এ ঘোর পিপাসা যুগ-যুগান্তরে
মিটিবে কি কভু আর!

... ..

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পিছনে ভয় -
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এইতো নিয়ম ভবে -
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে!

অনন্ত ঘুম আর স্বপ্নের নিভৃতি ও নিশ্চয়তা ছেড়ে জনজীবনের পারে অগণিত কোলাহলে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ এক ‘রক্ত বণিক পৃথিবীর’ অভিজ্ঞতার সম্মুখে দেখেছেন বিস্তৃত অন্ধকার। কিন্তু ‘মানুষের তরে এক মানুষের গভীর হৃদয়ে’র যে প্রত্যয় একদা ইতিহাসকে শাণিত করেছিল, তাই হয়ে যায় দূরাপসৃত - হৃদয়ের সুরঞ্জনা যুবকের বাহুল্য হয়ে হারিয়ে যেতে থাকে রাত্রির অন্ধকারে। পৃথিবীর গভীর অসুখের এইসব দিনে প্রত্যক্ষ করেছেন অন্ধকারের বিচিত্র প্রকাশ -

আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মতো, -
পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে হয়েছে আহত
একা-হরিণের মতো আমাদের হৃদয় যখন
জীবনের রোমাঞ্ছের শেষ হ’লে ক্লান্তির মতন
পাণ্ডুর পাতার মতো শিশিরে শিশিরে ইতস্তত
আমরা ঘুমায়ে থাকি! - ছুটি ল’য়ে চ’লে যায় মন! -

(প্রেম, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

কবির এই অন্ধকারচেতনা যত প্রগাঢ় হয়েছে, কবিতার বোধ তত স্থির প্রত্যয়ের ভূমি স্পর্শ করেছে – যা কখনো কখনো মৌল আলোকিত আস্তিকতার সুরে নিবিড় মন্দ্র, কখনো স্তিমিত-অবলোকন, অন্তর্লীন গভীরতায় নিমজ্জিত। অন্ধকারের এক রম্য কল্পজগৎ তৈরির আকাঙ্ক্ষা শুরু থেকে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি ঘটেছে ‘পৃথিবীর ধুলোয়কাদায়’, মাটির পৃথিবীর বাস্তবতায়। “স্বপ্ন ও বাস্তব, সাধ ও সত্তা, নীলিমা আর বসুন্ধরার বিষমানুপাতিক টান কবির উচ্চারণে সঞ্চারিত করেছে আততি ও গাঢ়তা, তাঁর সৃষ্টিতে সংযুক্ত করেছে সত্য উপলব্ধির গভীরতা।” (প্রদ্যুম্ন, ২০০০ : ৬০) তাই তাঁর কবিতায় অন্ধকার ও আলো সমার্থক অথবা এ দুয়ের গভীর মিথস্ক্রিয়ার পরিণতি :

চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর, –
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান!
ফসল উঠিছে ফ’লে, – রসে রসে ভরিছে শিকড়,
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ!
(জীবন, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এই অন্ধকার কোনো নেতিবাচক আবহ সৃষ্টি করে না। বরং নিয়ে আসে নতুন প্রাণের, নতুন জীবনের নির্মল সুবাস। আর তাই কবি বলতে পারেন –

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভরে
শস্য ফলে গেছে মাঠে, – কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা;
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ করে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা, –
(জীবন, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

অন্ধকারের এই নানামাত্রিক রূপকল্প রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে, যেখানে দুজনেরই প্রায় সমদৃষ্টি ও সমচেতনা রূপায়িত হয়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবনবোধের মৌল অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় অনেক রচনা তাঁর জীবদ্দশায় প্রচারযোগ্য বিবেচনা করেননি। সেই লেখাগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে এবং পাঠক বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছে, এতদিন যে জীবনানন্দকে তারা চিনেছেন, নতুন আবিষ্কৃত জীবনানন্দ তার চাইতে অনেক বেশি স্বতন্ত্র, বৈচিত্র্যময়, দর্শনমণ্ডিত। কবিতায় তিনি বলেছেন :

আমি তরু বলি :
এখনো যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার

আঁধারের থেকে আনে কী ক'রে যে মহানীলাকাশ,
 ভাবা যাক - ভাবা যাক -
 ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
 ভেদ ক'রে শোনা যায় গুপ্তস্বামীর মতো শত-শত
 শত জলঝারার ধ্বনি।”

(হে হৃদয়, বেলা অবেলা কালবেলা)

এ তবে কোন জীবনানন্দ! এগুলো কি তবে অজীবনানন্দীয় কবিতা? আসলে কোনো কবির ক্ষেত্রে বিশেষ ধাঁচের একটি পাঠ তৈরি হয়ে গেলে নতুন পাঠকেরা সেটাকেই অনুসরণ করে। অথবা সময়স্বভাবের নেতি-ইতির চেতনাও কবিতাবিচারে প্রভাব বিস্তার করে। শত হতাশা ও নৈরাজ্যের মাঝেও “ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি/ ভেদ করে শোনা যায় শত-শত/ শত জলঝারার ধ্বনি।” - এ উচ্চারণ যে জীবনানন্দ করেছিলেন, সেই তিনিই মাল্যবান, জীবনপ্রণালী বা কারুবাসনার মতো উপন্যাস রচনা করেছেন। অর্থাৎ এ থেকে জীবনানন্দ দাশের অভিপ্রায়ের এবং জীবনার্থের মূল জায়গাগুলো সহজেই চিহ্নিত করা যায়। রবীন্দ্রনাথও “মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ” - এ বোধে উত্তীর্ণ হতে গিয়েও ‘সভ্যতার সংকটে’ নিজের অস্তিত্বকে, বিশ্বমানবকে সংকটাপন্ন দেখেছেন। তারপরও ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত তিনি আশাবাদেই উন্নীত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতিতে দেখা যায়, তিনি সারাজীবন জীবনান্বেষণের মধ্যেই যে নিমজ্জিত ছিলেন তা নয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের অভিজ্ঞতা আত্মসচেতন বিবেকবান রবীন্দ্রনাথকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিলো। সংঘাতক্ষুদ্র অশান্ত বিশ্বজগৎ, ইতিহাস-সময়ের নির্মম অভিজ্ঞতার মাঝে রবীন্দ্রনাথের চেতনা বারবার রূপান্তরিত হয়েছে। “এই রূপান্তর ঘটে বিমূর্ত সত্তা ভাবনা থেকে মূর্ত মানবে, নির্দ্বন্দ্ব সৌন্দর্য আনন্দবাদ থেকে দ্বন্দ্বিক বস্তুসমাজে, রস রূপকল্পনা থেকে সংঘাতময় প্রতিবেশে, মনুয়ধর্মী শান্তিকামনা থেকে মানবতাবোধে ও বাস্তব কর্মযজ্ঞে।” (আকতার কামাল : ২০১৭ : ৩৭) ধ্বংস-ঝঞ্ঝাবাতে রক্তাক্ত হৃদয় নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের প্রশান্ত জীবনচেতনা ও ইতিবাচক চেতনায় উত্তরণের উৎস কিন্তু আদি দর্শন থেকে আগত। মাতৃগর্ভের অন্ধকারময় জঁঠর থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি সমগ্র অস্তিত্বে বিরাজমান, ফলে দুজনের কবিতার ভাবলোকে একটি আদিম সুর বিদ্যমান :

মনে হয়, যেন মনে পড়ে

যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঁঠরে
 অজাত ভুবনজগৎ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
 ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
 মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
 গর্ভস্থ পৃথিবী-পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন

তব মাতৃহৃদয়ের – অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

(সমুদ্রের প্রতি, সোনার তরী)

সিঞ্চুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাতের মতন
হৃদয় উঠিতেছে কোলাহলে কেঁপে বার-বার
কোথায় রয়েছে আলো জেনেছে তা, – বুঝেছে তা মন –
চারিদিকে ঘিরে তারে রহিয়াছে যদিও আঁধার!
একদিন এই গুহা ব্যথা পেয়ে আহত হিয়ার
বাঁধন খুলিয়া দেবে! – অধীর ঢেউয়ের মতো ছুটে
সেদিন সে খুঁজে লবে ওই দূর নক্ষত্রের পার
সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মতো ফুটে!

(অনেক আকাশ, ধূসর পাঞ্জুলিপি)

দুই কবির ভাষা ও প্রকাশের ভিন্নতা এখানে সময়ের দূরত্ব নির্দেশ করে বটে কিন্তু
জীবনোপলব্ধির ঐক্যে বিস্ময়কর ব্যঞ্জনাও সৃষ্টি করে। ‘অজ্ঞাত ভুবনজগৎ’-এর সঙ্গে
‘সমুদ্রের অন্ধকার গহ্বরের ঘুম’ জীবনোন্মেষের পূর্বাবস্থার প্রত্নস্মৃতিলোকে নিয়ে যায়।
বিশ্বসৃষ্টির জগাবস্থার সঙ্গে ডিম্বজীবনের অপ্রকাশিত অবস্থার সাদৃশ্য জন্ম বা আলোর
রহস্যময় অব্যক্ত পূর্বরূপেরই প্রকাশ। এখানেই দুই কবির চিন্তা, আবেগ ও জীবনার্থের
গভীরতর ঐক্যের সূত্রে অন্ধকার এবং আলোর সমধর্মী তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে।

কাব্যের মূল্য তার বাহ্যিক রূপে নির্ধারিত হয় না, সে রূপের অতীত কোনো এক
বৃহত্তর সত্তার ব্যঞ্জনাতে নিবিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সৌন্দর্যতত্ত্বেও হেগেলের সেই
দর্শনই প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি বলেছেন আর্ট হল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের
প্রকাশ, সীমার মাঝে অসীমের ব্যঞ্জনা। সাধকের বাণীর মতো শিল্পীর বাণীও তাই,
“তৎবেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ”। সেই মৃত্যুরূপ অন্ধকারের
সীমাতেও রবীন্দ্রনাথের সেই বেদনীয় পুরুষের জীবনে,

মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে –

সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।

(শিশুতীর্থ, পুনশ্চ)

আর সন্ধ্যাভিশিখরে অন্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভার মাঝেও বেদনার্ত তরুণ অধিপতি বলে,
থেমো না, বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।
অন্ধকারে তারা চলে।

পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
(শিশুতীর্থ, পুনশ্চ)

এখানে অন্ধকার জ্যোতির্ময়, ভয়হীন। যে অন্ধকারের পথ থেকেই মানুষকে যেতে হয় সৃজনের পথে, নির্মাণের পথে, যেখানে আলো গভীরতর হয় অন্ধকারের মাঝে। সেই অন্তহীন শোকের পথে অন্ধকার হয়ে ওঠে অগ্নিসুবর্ণের শক্তির মতো। জীবনানন্দের কবিতায়ও সেই পথচলার ইঙ্গিত স্পষ্ট :

তুমি আছো জেনে আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
তাই শুধু কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য, তবু হৃদয়ের কাছে ছিল অন্য-কোনো নাম।
অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
দীপাতিত লক্ষ্যে অবিরাম চ'লে যাওয়া।
শোককে স্বীকার করে অবশেষে তবে
নিমেষের শরীরের উজ্জ্বলায় অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে”।
(সূর্য নক্ষত্র নারী : বেলা অবেলা কালবেলা)

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে রোমান্টিসিজম, শিল্পকলার নবজাগরণের যে পথ খুলে দিয়েছিল, তার মধ্যে অনেক শিল্পবোদ্ধাই দেখেছেন সম্ভাবনার অনন্ত বিস্তার। গ্রাহাম হগ বলেন :

A whole new territory of poetic possibilities had been opened up by the romantic imagination. (Hough: 1970: 191)

প্রথম পর্যায়ের রোমান্টিক কবিদের কাছে ‘অন্ধকার’ মূলত আলোর বিপরীত সত্য, ভালো-মন্দের স্বরূপ নির্ধারক এবং সৃষ্টি ও সৃষ্টিহীনতার প্রতীক। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে লর্ড বায়রনের Darkness কবিতার নাম, যেখানে কবি অন্ধকারকে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ করে তুলেছেন:

The waves were dead; the tides were in their grave,
The moon, their mistress, had expir'd before;
The winds were wither'd in the stagnant air,
And the clouds perish'd; Darkness had no need
Of aid from them! She was the Universe.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তার চেয়েও স্বতন্ত্র। তাঁর কাছে অন্ধকারই অন্ধকারের উত্তরণের পথ। গীতবিতানের গানে তাই বলেছেন :

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে
ওহে অন্ধকারের স্বামী।

এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবন-পারে
আমার চিত্তে এসো নামি।
এ দেহ মন মিলায়ে যাক, হইয়া থাক হারা
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
(গীতবিতান : পূজা : ৯৩)

রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক জীবনচেতনা জীবনানন্দের কবিতায় ভিন্ন রূপে ও তাৎপর্যে ধরা পড়েছে। জীবনার্থের ঐক্যে দুই কবি যে কাব্যফসল ফলিয়েছেন, বাংলা কবিতায় তা তুলনারহিত। ইউরোপের কাব্য আন্দোলনই প্রথম অতীন্দ্রিয় জীবনসত্য ও আধ্যাত্মিকতাকে মানবিক বোধের বহুস্তরিক প্রকাশের অবলম্বন করে। রেনেসাঁস পরবর্তীকালে কবির আত্ম-আবিষ্কার একই সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতির সমান্তরাল হয়েছে : The emphasis shifts from social man to the individual man, when he is alone with his own heart or alone with nature (Hough, 1970: 8) রোমান্টিকতার এই সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের কাজটি সহজ হয় আধুনিক বাংলা কবিতার শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত বুদ্ধদেব বসুর শরণ নিয়ে। শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি রোমান্টিকতার যে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, তাকে বলা যায় রোমান্টিকতার চিরকালীন সংজ্ঞার্থ। তিনি বলেন :

রোমান্টিক শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তিমানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয় শুধু ইঙ্গিত করা এটিকেট মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।
(বুদ্ধদেব বসু, ১৯৮৮ : ৪-৫)

তবে রবীন্দ্রনাথ বোদলেয়ারের মতো ক্লাসিক-রোমান্টিকের সীমারেখা লুপ্ত না করে রোমান্টিকতার অধিকতর জীবন ও চৈতন্যমুখী স্বভাবধর্মের জন্ম দেন। আধ্যাত্মিকতা বা রহস্যময়তার যে প্রয়োগ রবীন্দ্রকাব্যে লক্ষ্য করা যায়, তা আসলে চেতনার বহুবিস্তারের পথকে উন্মোচন করে দেয়।

রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের স্বরূপ নির্ণয় দুঃসাধ্য একটি কাজ। ‘রোমান্টিক শব্দটি এত বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যার ফলে এর একক সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা অত্যন্ত দুর্লব।’ (Bowra: 1961: 271) উইলিয়াম ব্লেকের Songs of Innocence (১৭৮৯)-এর প্রকাশকাল থেকে শুরু করে কিটস ও শেলির মৃত্যু পর্যন্ত (১৮২২) সময়সীমাকে রোমান্টিসিজমের কাল বলে চিহ্নিত করেছেন মরিস বাউরা। যদিও ঐ সময়ের প্রধান

পাঁচ কবির কাব্যাদর্শ ও কাব্যরূপে তেমন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। ব্লেক, কোলরিজ, ওয়র্ডসওয়ার্থ, শেলি এবং কিটস-এর কবিতা পাঠ থেকে এই ভিন্নতা উপলব্ধি করা যায়। এই পাঁচজন কবির কবিতা উপলব্ধি থেকে রোমান্টিকতার কোনো একক সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করা সহজ নয়। রোমান্টিক বিষাদের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে মারিও প্রাজ অ্যান্টিথিসিসের কথা বলেছেন (Classic-Romantic) (Praz, 1951: 57)। ফলে মহাপাপ বা অন্ধকারের প্রতীক শয়তান (Satan) রোমান্টিকদের হাতে পরিণত হল আলোকিত মুক্তিচেতনার প্রতীকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই বিপরীতধর্মী দ্বন্দ্বিকতায় উত্তরণের সূত্র প্রযোজ্য। তিনি উপনিষদ-বাউল দর্শন-বৈষ্ণবদর্শন এবং বেহ্মাম-মিল-স্পিনোজার দর্শনকে একটি থিসিসের আকারে গ্রহণ করে নিজের বোধ, চেতনা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি অ্যান্টিথিসিস দাঁড় করিয়েছেন এবং এই পথ ধরেই পৌঁছেছেন সিনথিসিসে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাব্যচর্চা শুরু করেন, তখন রোমান্টিক জীবনাদর্শ বিশ্বকবিতায় তাৎপর্যহীন হতে শুরু করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নবচেতনায় রোমান্টিকতা তাঁর নিজস্ব জীবনাদর্শ, সমাজদর্শন এবং ব্যক্তিসত্তা ও সমষ্টিসত্তার মিশ্রণে নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে রবীন্দ্রনাথ যদি রোমান্টিক কবি হন, বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের কবি জীবনানন্দ দাশকে কিভাবে রোমান্টিক কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। একটি বিষয় মনে রাখলে এর উত্তর সহজেই পাওয়া যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও রবীন্দ্রনাথ অনেককাল বেঁচে ছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ ও মানববিনাশের নৃশংস আয়োজনের কালে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেন। ব্যক্তি ও সমষ্টির ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সমাজজীবন ও বিশ্বজনীন ঘটনাপ্রবাহের মিশেলে রবীন্দ্রসত্তার যে উৎসারণ, তাকে তো এক রোমান্টিক শব্দ দিয়ে সীমায়িত করা যায় না। জীবনানন্দের কাব্যযাত্রা শুরু হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো দুই রোমান্টিক কবির কাব্যছায়াতে। কিন্তু সময় স্বভাবের অনিবার্য টানে তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পিসত্তা আলাদা ও নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। শিল্পকলার একটি অন্তর্গূঢ় সত্যের মতো এক চেতনা থেকে অন্যচেতনায় সৃজনের যে আসা-যাওয়া, তা পৃথিবীর অনেক কবির কবিতাতেই লক্ষ করা যায়। রোমান্টিকতাকে চিরকালীন শিল্পপ্রেরণার অন্যতম স্বভাব হিসেবে চিহ্নিত করেই রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশের কবিতার বিশেষ লক্ষণ বিবেচনা করা হয়, যেখানে অন্ধকার একটি গুরুত্বপূর্ণ চেতনার অংশ হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে।

আলো প্রকাশ্য, আলো দৃশ্যমান; অন্ধকার অপ্রকাশ্য, অদৃশ্য, প্রাণের জন্মভ্রমের মতোই বিকাশধর্মী ও রহস্যময়। আলো আর অন্ধকারের এই দ্বৈরথেই মানব-অস্তিত্বের পথচলা। অন্ধকার সবসময় আলোর বিপরীতার্থক অর্থ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হলেও কবিতার গভীর ইন্দ্রিয়াতীত অর্থে রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের পরবর্তী সময়ে ব্যাপক রূপ লাভ করে। কারণ অতি সাধারণ মানুষ থেকে কালজয়ী প্রতিভা পর্যন্ত সকলেই আলো-

অন্ধকারের মানদণ্ডে জীবনকে বিচার করেন। কিন্তু একজন কবি বা শিল্পীর জীবনদর্শনের মূল্যসন্ধানের মানদণ্ড হয়ে ওঠে যখন আলো-অন্ধকার, তখন উপলব্ধির ভিন্নতায় সেগুলো নতুন করে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কবির আত্মরূপের রহস্য সন্ধানে যদি তাঁর অন্ধকার ভাবনাকে উপলক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়, তবে জীবনোপলব্ধির নতুন কোন প্রান্তরের গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব। তেমনটা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জীবনানন্দ দাশের কাব্যদর্শনের মধ্য দিয়ে – যাঁদের কবিতায় ‘অন্ধকার’ সৃষ্টির আদিম রহস্যময় অবস্থা থেকে জীবনের গভীরতর বোধ ও উপলব্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত।

সহায়ক-গ্রন্থ

- কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী (১৪১৭)। বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ভাষাবিন্যাস, কোলকাতা
বেগম আকতার কামাল (২০১৭)। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা, কথাপ্রকাশ, ঢাকা
জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র, আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, অবসর, ঢাকা
প্রদ্যুম্ন মিত্র (২০০০)। কবিতার গাঢ় এনামেলে : জীবনানন্দের কাব্যভাবনা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪৮০)। বিশ্বভারতী, কলিকাতা
রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪০২)। বিশ্বভারতী, কলিকাতা
শ্যামল কুমার ঘোষ (১৩৯৪)। কবিতার চিত্রকল্প: কবি জীবনানন্দ দাশ, বইপত্র, কলিকাতা
সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৯৭)। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
Bowra, S. M. (1961), *The Romantic Imagination*, Oxford University Press, Lonon, U. K.
Chunkapura, Jose (2008), *The God of Rbindranath Tagore*, VISVA BHARATI, India
Hough, Graham (1970), *Romantic Poets*, London, United Kingdom
Hulme, T. E. (1993), *The Collected Writings of T. E. Hulme*, (Edited by) Karen Csengeri, Oxford University Press, United Kingdom
Praz, Mario (1951), *The Romantic Agony*, Oxford University Press, United Kingdom